বাবু বৃত্তান্ত

সমর সেন

রাশিয়া বিরাট দেশ, পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ। জারেরা পরদেশ দখলে বেশ তৎপর ছিলেন। সেগুলি ধ'রে রাখা উত্তরাধিকারীদের মহান কর্তব্য, লেনিনের নীতিবিরুদ্ধ হলেও। ইচ্ছে ছিল আরও কয়েকটি প্রজাতন্ত্রে ঘুরে আসব, কিন্তু ছুটিতে দেশে আসার ঝোঁকে হয়ে ওঠেনি। একেবারে ফেরার সময় সমরকন্দ ও বোখারার টিকিট কাটার চেষ্টা করি, কিন্তু ইনট্যুরিস্টের তাচ্ছিল্যে এত চটে গেলাম যে সটান দিল্লি ফিরি। রুশি বিদেশি দপ্তরে সাংবাদিক হিসেবে অভিযোগ করাতে তাঁরা বলেছিলেন সব বন্দোবস্ত করে দেবেন, প্রথমে তাঁদেরই সঙ্গে কথা বলা উচিত ছিল—কিন্তু তখন মনস্থির করে ফেলেছি।

সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতা কয়েক পাতায় লেখা যায় না, বিশেষ করে রাশিয়ার মতো বিরাট ও নানা অর্থে বিচিত্র দেশের বিষয়ে। তবে এমন অনেক অভিজ্ঞতা ঘটেছে যার কথা লিখব না। আমরা অনুবাদ করে জীবনধারণ করতাম, ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মতো অতিথি হিসেবে রাজকীয়ভাবে থাকিনি—ভালো হোটেল, গাড়ি, দোভাষিণী ইত্যাদি ইত্যাদি। সে জন্য মুখ বন্ধ রাখার বাধ্যবাধকতা আমার নেই, কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রতাজ্ঞানে লাগে। তাছাড়া প্রাচ্যের মাপকাঠিতে পাশ্চাত্যের বিচার অনুচিত। তবে রুশ পত্রপত্রিকা গল্প-উপন্যাসে ক্রমাগত যে 'নতুন মানুষ' সৃষ্টির কথা শুনেছি, সেই নতুন মানুষ চোখে পড়েনি। গ্যাগারিনকে আচারে ব্যবহারে ব্যতিক্রম মনে হয়েছিল। এক হিসেবে রুশিরা অরাজনৈতিক। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন পাঠ্যপুস্তকে পরিণত হলে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মতো আন্দোলন না হলে বোধহয় লোকে কর্তাভজা ও অরাজনৈতিক হয়। কম ও বেশি রোজগারি পরিবারের অভীপ্সা ছিল আলাদা ফ্ল্যাট, রেফ্রিজেরেটর, টেলিভিশন, দাচা (শহরের বাইরে বাড়ি, সেটা সরকারের সম্পত্তি নয়) ইত্যাদি, এখন বোধহয় মোটরগাড়ি। 'পোটেমকিন'-এর দেশে 'আওয়ারা' ও রাজ কাপুর নিয়ে উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না, 'পথের পাঁচালী' পাত্তা পেত না। কারণ? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অসম্ভব ট্র্যাজেডি ও যন্ত্রণার পর দুঃখ-দারিদ্রের ছবি ভালো লাগে না। আমেরিকান জীবনযাত্রা সম্বন্ধে মোহ তখনই দেখেছি। বিদেশে যাওয়া কঠিন বলে বন্ধুবান্ধবীরা (অফিসের লোক নয়) আক্ষেপ করতেন। তাঁদের মতে রাশিয়া ঠিক ইউরোপীয় দেশ নয়।

তিন বছর একটানা ওখানে থেকে দেশে এলাম ছুটিতে। মস্কোয় ফিরে আগেকার মতো ভালো লাগল না। একটা কারণ, শিক্ষার জন্য দুই মেয়েকে দিল্লিতে রেখে আসি। তাছাড়া আমরা যে পাড়ায় থাকতাম সেখানে ভারতীয় অনুবাদক বলতে গেলে আর কেউ ছিলেন না। আড্ডার জন্য যেতে হত বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়, সেখানে বেশির ভাগ আলাপী ভারতীয়রা থাকতেন।

১৯৬১-তে দুই মেয়েকে নিয়ে আবার ফিরে যাই মস্কোয়, ভেবেছিলাম কয়েক বছর থেকে যাব। কিন্তু বড়ো মেয়েকে লুমুম্‌বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করতে পারলাম না—'লাল ফিতে'র জন্য। কলকাতায় থাকতে শুনেছিলাম বয়স বাড়ছে, দেশে ফিরে চাকরি পাওয়া কঠিন হবে। ভেবেচিন্তে ছ-মাস পরে পাততাড়ি গুটোলাম, অগাস্ট মাসে, মাঝরাতে বিমান বন্দরে অনেক বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গ ছেড়ে।

কলকাতায় ফিরে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি নিই। ১৯৬১-তে মস্কো ফেরার আগে দিল্লি থেকে টেলিফোনে কথা হয় সংস্থার পরিচালকের সঙ্গে। কোনো চিঠিপত্রের বিনিময় হয়নি। ফোনে বললাম ছ'মাসের আগে ফেরার সম্ভাবনা নেই। পরিচালক জানালেন, ছ'মাসের মধ্যে পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, যদিও সম্ভাবনা কম। মস্কো পৌঁছে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করিনি—ভদ্রলোকের এক কথায় বিশ্বাস করতাম।

ফিরে এসে অফিসে দেখা করাতে পরিচালক পরিহাস করলেন—খাস মস্কো থেকে একেবারে আমেরিকান সংস্থায় আসছেন! আমার ধারণা ছিল সংস্থাটি ইংরেজদের। যাই হোক, মস্কোয় সাধারণ লোকেদের মধ্যে আমেরিকার প্রতি বিদ্বেষ খুব দেখিনি, যদিও কয়েকবার অপ্রীতিকর আন্তর্জাতিক ঘটনা ঘটে, যেমন ইউ-টু বিমানের ব্যাপারটা। গ্যারি পাওয়ারসের বিচারে উপস্থিত ছিলাম, সাংবাদিক হিসেবে (দেশ থেকে আইনজীবীদের প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলেন স্নেহাংশু আচার্য), কিন্তু ওসব ষড়যন্ত্রের মূলে তো ইয়াঙ্কি সরকার, সাধারণ মানুষ নন। তাছাড়া আমেরিকার সঙ্গে সমঝোতায় ক্রুশ্চেভের সবিশেষ আগ্রহ ছিল। আসলে মস্কো থেকে যখন ফিরি তখন অনেকটা অরাজনৈতিক ছিলাম, ওখানকার সঙ্গ-দোষে বা গুণে।

বিজ্ঞাপন সংস্থায় সাত মাস ছিলাম। কাজের চাপ খুব একটা ছিল না, তবে ন'টা থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অফিসে ভালো লাগত না। বিজ্ঞাপন লেখার 'সৃষ্টিশীল' কাজে উৎসাহ পেতাম না। লাঞ্চের সময় বেরিয়ে যে গল্প করব তার উপায় ছিল না, কেননা অফিস থেকে বাড়ির দূরত্ব আধ মিনিট।

সাত মাস পরে কলকাতায় একটি দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় যুগ্ম সম্পাদকের পদে যোগ দিই। সম্পাদকীয় লিখতে হত না, সেজন্য খোশমেজাজে ছিলাম, কেননা কর্তৃপক্ষের পলিসির সঙ্গে মতের মিল ছিল না। একটা খুপরি ঘরে বসে প্রবন্ধ এডিট করা, সংবাদ পরিবেশনে নজর রাখা, দেশের বিভিন্ন স্থানে সংবাদদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ইত্যাদি ছিল আমার কাজ। অফিসে দলাদলির অন্ত ছিল না, কিন্তু কখনো জড়িয়ে পড়িনি। ১৯৬২-তে একবার মাদ্রাজ যাই দিন দশেকের জন্য একটি সেমিনারে; সেমিনার বসত 'হিন্দু' পত্রিকার অফিসে। 'হিন্দু'র ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন দেখার মতো। অত্যন্ত solid পত্রিকা সেজন্য কিছুটা নীরস। সেমিনারের সময় ইন্ডিয়ান প্রেস ইন্সটিটিউটের পত্তনের কথা শুনি।

দৈনিক পত্রিকায় যোগদানের পর সবচেয়ে বড়ো ঘটনা চিন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। তখন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নিরপেক্ষ, তবে রাশিয়া ঘেঁষা। সংঘর্ষকে উপলক্ষ করে গজিয়ে ওঠা সংগঠনগুলিতে চাঁদা দিইনি, কিন্তু 'দেশরক্ষার' জন্য মাইনে থেকে চাঁদা কাটা গেলে আপত্তি করিনি। চিন সম্বন্ধে বিদ্বেষ ছিল না। একদিন অতি ভোরে ঘুম থেকে উঠে কেন জানি মনে হল চিন যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে একতরফাভাবে পিছিয়ে যাবে, ভারত জয়ের অভিলাষ চিনের নেই। চিনের ঘোষণার পর নিজের দূরদর্শিতা নিয়ে কয়েকবার জাঁক করাতে নিরঞ্জন মজুমদার জানালেন যে টাইমস অফ ইন্ডিয়ার নানপুরিয়া এই ভবিষ্যদ্বাণী বেশ কিছুদিন আগে দুটি দীর্ঘ প্রবন্ধে যুক্তিসহ করেছেন। তাছাড়া নিজের দূরদর্শিতা নিয়ে বড়াই করলে লোকে ভাববে বৈদেশিক কোনো সূত্রের সঙ্গে আমার গোপন যোগাযোগ আছে।

পরের বছর রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের ব্রিটেন সফরকালে একটি সাংবাদিক দলের সঙ্গে যাই, ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে। তখন প্রফিউমো কেচ্ছা চলেছে। ম্যাকমিলান সাহেব উদ্‌ভ্রান্ত, রাধাকৃষ্ণনকে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে টুপি খুলতে ভুলে গিয়েছিলেন আধ মিনিট। মাস খানেক ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডে ছিলাম, পুরোনো দু-তিনজন বন্ধুবান্ধবীর সঙ্গে দেখা হল। তারপর পনেরো দিন ছিলাম পশ্চিম জার্মানিতে। ইংলন্ডে লেবার পার্টির তুলনায় টোরিরা ছিল বেশি বিনয়ী। পশ্চিম জার্মানিতে সবচেয়ে বিক্ষোভ দেখেছি বার্লিন প্রাচীর নিয়ে। দেড় মাস পরে দেশে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, বিদেশ ভ্রমণের ধকল বেশিদিন ভালো লাগে না। সেই শেষ বিদেশ যাত্রা। ১৯৬৭-র ডিসেম্বরে কিউবা থেকে নিমন্ত্রণ আসে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে। সম্মেলন বসে জানুয়ারির শুরুতে। আমার পাসপোর্টের মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল। নতুন পাসপোর্ট পেলাম এপ্রিলে—কিউবার নাম কাটা। তখন Now পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম। কেন যে ইন্দিরা সরকার সময় মতো পাসপোর্ট দেয়নি, কিউবা কেন তালিকা থেকে বাদ গেল, অনেকদিন ভেবেছি। পরে মনে হয়েছে, ১৯৬৭-র মে মাসের মাঝামাঝি দিল্লির চিনা দূতাবাসের প্রথম ও তৃতীয় সচিব আমার সঙ্গে দেখা করেন অফিসে। কয়েক দিন পরে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়। হয়তো ভারত সরকারের দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে গুয়েভারার দেশে গেরিলাযুদ্ধে তালিম নিয়ে নকশালবাড়ির সশস্ত্র আন্দোলনে সাহায্য করব। কিছু কিছু মহলে শুনেছি যে চিনা দূতাবাসের সচিবেরা আমাকে কয়েক বান্ডিল কাগুজে টাকা দিয়েছিলেন।

কলকাতার দৈনিক পত্রিকা ছাড়ি ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন নিয়ে মতানৈক্য ঘটাতে। তখনকার মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের সঙ্গে সম্পাদকদের একটা 'ভদ্রলোকদের চুক্তি' হয় যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের নিয়ে নানা রটনা অন্তত কয়েকদিন যেন প্রাধান্য না পায়। হঠাৎ এক অস্ট্রেলিয় সাংবাদিক ঢাকা ঘুরে এসে খবর দিলেন যে আদমজী পাটকলে নিহতের সংখ্যা অন্তত দশ হাজার। মালিক ও অধিকাংশ সম্পাদকরা অতিশয় উত্তেজিত; আর একটি বৈঠকে প্রফুল্ল সেনকে বলা হল যে এ খবর

চাপা দেওয়া হবে না। বৈঠক থেকে ফিরে আমাদের সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মালিককে বললাম ইংরেজি দৈনিকে খবরটা ফলাও করে ছাপাতে আমরা চাই না। তিনি রাজি হলেন। হঠাৎ তাঁকে জানালাম যে তাঁর বাংলা দৈনিকে ইতিমধ্যে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমার বিবমিষা হয়। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে উত্তর দিলেন—কিছুদিন ধরে আমার এ মনোভাবের আঁচ তিনি পেয়েছেন। ইংরেজি পত্রিকা আমাদের মতে চালাতে পারি, বাংলা দৈনিকের কথা আলাদা। হক কথা, খুশি হয়ে নিজের খুপরি ঘরে ফিরলাম। দিনকয়েক পরে, ৩০শে জানুয়ারি (গান্ধীজির মৃত্যু দিন) সকালে ইংরেজি পত্রিকায় দেখলাম আগেকার চেপে যাওয়া নানা অদ্ভুত রিপোর্টের সঙ্গে আরও অনেক কিছু ফলাও করে ছাপানো হয়েছে। অফিসে গিয়ে শুনলাম মালিকের নির্দেশ। সেদিন পদত্যাগ পত্র পাঠাই। তারপর আমার ঘরে লোকের আনাগোনা প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। বিগত সরোজ আচার্য ছাড়া, যাঁর মতো নিরভিমান ও গুণী লোক বিরল। তাড়াতাড়িতে লেখা পদত্যাগ পত্রে আসল কারণের উল্লেখ ছিল না। ছিল একটা অভিমানের সুর। একটা নীতিনিষ্ঠ জ্বালাময় বিবৃতির সুযোগ হারাই। ফলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে গেল, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হল না। একথা বলেন অন্যরা।

নতুন চাকরির চেষ্টা শুরু হল। চঞ্চল সরকার (ইন্ডিয়ান প্রেস ইন্সটিটিউটের) ও অমিতাভ চৌধুরি ('শ্রীনিরপেক্ষ') বাড়িতে এসে বললেন বাগবাজারী পত্রিকায় কাজ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত হল না। আমার পদত্যাগের ব্যাপার আতোয়ার রহমানের কাছে শুনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সদস্য আমার এককালীন অধ্যাপক হুমায়ুন কবির কিছুদিন পরে জানালেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদি জোরদার করার জন্য একটি সাপ্তাহিক প্রকাশ করা বিশেষ দরকার। সম্পাদনার ভার দিলেন আমাকে। প্রায় ছ'মাস প্রস্তুতির পর Now পত্রিকা প্রথম বেরল অক্টোবরের প্রথমে (১৯৬৪)। শুনেছিলাম সাপ্তাহিক চালানো কঠিন ব্যাপার, দুঃসাধ্য পরিশ্রম করতে হয়। খাটতে অবশ্য হয়েছিল অনেক, কতজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা, পত্রালাপ। ব্যাবসায়িক দিকটা নিয়ে চিন্তা করতে হয়নি। শুরু হবার পর নিয়মিত প্রকাশনে ছেদ পড়েনি।

'নাও'-এর সহকারী সম্পাদক হিসেবে মাস দেড়েকের জন্য প্রথমে কাজ করেছিলেন পুসি সেন। লোকেশ ঘটক (ঋত্বিকের ভাই) শুনেছিলাম চাপে পড়ে ভালো লেখেন; কিন্তু সকালে যে অবস্থায় অফিসে পৌঁছতেন তখন চাপ দেওয়া সহজ ছিল না। এরপর বেশ কিছুদিন শ্যামলেন্দু ব্যানার্জি ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত জাগতেন (অফিসে নয়), অনিদ্রার অবসাদ কাটত বেলা দেড়টা নাগাদ কফি হাউসে। সংশোধনবাদ সম্বন্ধে প্রখর ভাবে সচেতন ছিলেন। ও বিষয়ে আমি বিশেষ ওয়াকিবহাল তখনও ছিলাম না। শ্যামলেন্দুর পরে আসেন নিত্যপ্রিয় ঘোষ। 'নাও' এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এ নিয়মিত সম্পাদকীয় লেখকদের মধ্যে ছিলেন নিরঞ্জন মজুমদার ('ফ্রন্টিয়ার'-এ বেশিদিন নয়), শঙ্কর ঘোষ, অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র,

অমলেন্দু দাশগুপ্ত, নয়ন চন্দ, কুণাল বোস, জয়ন্ত সরকার ইত্যাদি। কখনো কখনো সম্পাদকীয় লিখতেন নির্মল চন্দ্র, অশোক রুদ্র প্রমুখেরা—এঁদের প্রবন্ধের উল্লেখ এখানে করছি না।

প্রথম প্রথম পত্রিকাটি ছিল দেশি-বিদেশি খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনার সমষ্টি, বিশেষ একটি 'চরিত্র' দানা বেঁধে ওঠেনি। সম্পাদকীয় লেখকদের দু-একজনের (বিশেষ করে অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের) প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত একটা বামপন্থী রূপ আসে। কবির সাহেব দিল্লি থেকে চিঠি লিখে মৃদু আপত্তি জানাতেন, কিন্তু খবরদারির চেষ্টা করেননি। বঙ্গদেশীয় রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার আগে তাঁর একটা অধ্যাপকসুলভ, উদারপন্থী (liberal) মনোভাব ছিল। 'নাও'তে প্রকাশিত অনেক কিছু কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাঁর ক্ষতি করে বলে আমার বিশ্বাস, (এ বিষয়ে অতুল্য ঘোষ মশাই বলতে পারেন) কিন্তু পত্রিকায় মন্ত্রীসুলভ উদ্ধত হস্তক্ষেপ তিনি করতেন না। তাঁর কয়েকটি লেখা পর্যন্ত আমরা ছাপাইনি। সত্যিকার গণ্ডগোল শুরু হয় ১৯৬৭-র নির্বাচন ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও পতনের পর, যে দুটোতেই তাঁর হাত ছিল। 'হিংসাত্মক' আন্দোলনের বিস্তারে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, সিপিএম-এর বর্ধমান প্রভাব মনে দুশ্চিন্তা আনে। 'নাও'-এর কাটতি বেড়ে চলেছে শুনে অস্বস্তিবোধও প্রকাশ করতেন। মনস্থির করতে কিন্তু তাঁর সময় লাগত।

১৯৬৭-র জানুয়ারিতে বাড়িতে একটি দুর্ঘটনায় আমার ডান হাত জখম হওয়াতে শরীর ও মেজাজ ভালো ছিল না। হঠাৎ একদিন কবির ডেকে পাঠালেন। একে অফিস যাবার আগে, যানবাহনের অসুবিধে, তায় হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধা, বিরক্ত হয়ে সেন্ট্রাল গভর্মেন্ট হস্টেলে উপস্থিত হয়ে দেখলাম একটি ভদ্রমহিলা ও একজন সাহিত্যিক বসে আছেন। কবির বললেন নির্বাচনের আগের সংখ্যাগুলিতে তাঁর লেখা দুটি সম্পাদকীয় ছাপাতে হবে। কোন পার্টির সমর্থনে? বাংলা কংগ্রেস। বললাম ও বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার ভার ইতিমধ্যে একজনকে দিয়েছি। কবির বললেন অন্য সম্পাদকীয় বের করা চলবে না। এভাবে তিনি কখনো আমাকে নির্দেশ বা আদেশ দেননি। বললাম, তাহলে বিনা বিলম্বে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দুজনের যাওয়া দরকার। সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানালাম, তিনি যে নতুন সম্পাদক হচ্ছেন তার ডিক্লারেশন ওখানে করা নিয়ম। কবির শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে বললেন A correspondent writes এ ভাবে ছাপালেও চলবে (মন্তব্যে ওঁর নাম বেশ কিছু জায়গায় বাদ দিয়ে ছাপানো হয়)। সেদিন অফিসে গিয়ে আতোয়ার রহমানের কাছে শুনলাম যে কবিরের ঘরে উপস্থিত ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্ত্রী। আগে জানলে হয়তো এতটা উদ্ধত ব্যবহার করতাম না। কবির সাহেবের আর একটি মন্তব্য ইচ্ছে করে ধরে রেখে নির্বাচনের আগে না ছাপিয়ে ভুল করি। কেননা বক্তব্য যাই হোক, নির্বাচনের

ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ প্রায় নির্ভুল প্রমাণিত হয়। এসব ব্যাপারের পরও কবিরের ব্যক্তিগত ব্যবহারের পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট গঠনের পর 'নাও' ছিল সিপিএম-এর সমর্থক। বেশিদিন নয়, অন্তত ব্যক্তিগতভাবে নয়। নকশালবাড়িতে নারী ও শিশু হত্যার পর সিপিএম-এর ক্ষীণকণ্ঠ প্রতিবাদ, বিক্ষুব্ধদের বিতাড়ন ও যেন-তেন-প্রকারেণ সরকারে টিঁকে থাকার 'রণকৌশল' আমাকে মোহমুক্ত করে। রাষ্ট্রপতির শাসন যেভাবে চাপানো হয় তাতে সাময়িকভাবে সিপিএম-কে সমর্থন করা হয়। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পিছনে কবিরের হাত ছিল অনেকটা। তার কিছুদিন পরে আমাকে পত্রপাঠ 'নাও' থেকে পদত্যাগ করার (বেআইনি) আদেশ আসে। দু-তিন সপ্তাহ 'প্রতিরোধ' করি; তারপর দেখলাম অর্থবল যখন অন্যদের, নেশন ট্রাস্টের, তখন একলা লড়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া, আতোয়ার রহমান (তাঁর সরকারি অফিস ও 'চতুরঙ্গ'র কার্যালয় ছিল পাশের ঘরে, তিনি কবিরের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন নানাভাবে) খবর দিলেন যে একজন ম্যানেজিং এডিটর নেওয়া হচ্ছে, ফলে আমাকে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকতে হবে। বুঝলাম বেশি দিন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়ে জানুয়ারির (১৯৬৮) প্রথম দিকে অফিস থেকে পাততাড়ি গুটোলাম।

প্রথম দিকে 'নাও' এর সঙ্গে যাঁরা মাসিক ভিত্তিতে যুক্ত ছিলেন তাঁদের একজন উৎপল দত্ত। আমি অফিসে পৌঁছবার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে ও নির্ভুলভাবে কাজ শেষ করে চলে যেতেন। ক্রমশ নাটক গোষ্ঠীর চাপে লেখা কমে আসতে থাকে, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক পালাবদল সুবিদিত—'তীর' হতে এখন বামফ্রন্টের তরী—কিন্তু তাঁর ক্ষমতা অনস্বীকার্য। অবশ্য শুনি যে 'line' ঠিক না থাকলে শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু গণ্ডগোল হয়ে যায়। আর্থিক উন্নতি ছাড়া।

নিয়মিত লিখতেন নীরদ চৌধুরি। দু-একবার তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে DIR প্রয়োগ হতে পারে শুনেছিলাম, বিশেষ করে ১৯৬৫-র ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর বক্তব্য। লিন্ডসে এমারসনের (ইংরেজিতে দুটো M—Emmerson—তাঁর ভাষায়, "to distinguish myself from the great American bore") জবাব ছাপাতে খুব সম্ভব বিপদ কেটে যায়। চিন বিষয়ে পণ্ডিত সুন্দরলালের প্রবন্ধ নিয়ে একই গুজব শুনি। শেষ পর্যন্ত, ইন্দিরা গান্ধীর বিষয়ে সচিত্র প্রবন্ধ একবার ছাপার পর দ্বিতীয়টিতে আপত্তি করাতে নীরদবাবু লেখা বন্ধ করেন। তাঁর আগে দু-একবার বন্ধ করেছিলেন।

সুকুমার রায়ের কবিতার ইংরেজি অনুবাদ বোধ হয় প্রথম 'নাও'তে বের করেন সত্যজিৎ রায়। তাছাড়া মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখতেন, লিখতেন অনেক নামকরা ব্যক্তি। পত্রিকার সূত্রে দেশি-বিদেশি অনেকের সঙ্গে আলাপ হয়, সাক্ষাতে বা চিঠিপত্রের মাধ্যমে। পরে আরও অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সূত্রে। সে যুগে 'নাও'-র যে

বিশেষ একটি ভূমিকা ছিল সে বিষয়ে অবহিত হই 'এক্ষণ'-এ প্রকাশিত অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধ পাঠের পর। অবশ্য বিদেশে প্রকাশিত তাঁর Calcutta Diary-তে 'নাও'-এ তাঁর রচিত কোনো লেখা স্থান পায়নি।

সাপ্তাহিক চালনায় বেশ কিছু কৌশল রপ্ত করা দরকার। নানান ধরনের লেখক, অনেকে স্পর্শকাতর, সমালোচনায় অসহিষ্ণু। গোষ্ঠী টিঁকিয়ে রাখতে সম্পাদককে অল্পবিস্তর মিথ্যার সাহায্য নিতে হয়, মাঝে মাঝে ন্যাকা সাজতে হয়। এসব গুণ রপ্ত করেছিলাম 'পত্রিকার স্বার্থে'। 'নাও' এর Letters to the Editor (ব্যক্তিগত) ফাইল সরাবার কথা তখন মনে হয়নি। তবু হাতে বেশ কিছু চিঠিপত্র আছে, কিন্তু পত্রলেখকদের অনুমতি ছাড়া ছাপানো নাকি বেআইনি। তাছাড়া উত্তরে আমি যা লিখেছি তার কপি নেই—এবং মনে নেই বলে সাহস হয় না। 'নাও'-এর ব্যক্তিগত ফাইলটি মূল্যবান, তবে আমার ধারণা সেটার হদিশ পাওয়া যাবে না, বিশেষ করে আতোয়ার রহমানের মৃত্যুর পর।

'নাও' থেকে বিতাড়িত হবার হপ্তা দুয়েক পরে নতুন পত্রিকার প্রস্তুতি শুরু করি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে আমার বিতাড়নের কিছুটা সম্বন্ধ ছিল বলে ভাবী পত্রিকার বিষয়ে সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতির অভাব হয়নি। অনেকের সঙ্গে আলোচনার ফলে ধারণা জন্মে যে ৬০,০০০ টাকা তোলা কঠিন হবে না। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' বেরোবার মুখে হাজার ন'য়েক ওঠে, ভাইবোন ও বন্ধুদের কাছ থেকে। 'নাও'-এর গ্রাহক ও এজেন্টের তালিকার কপি আমার কাছে ছিল। তিন সপ্তাহে ৬০০ পোস্টকার্ড নিজের হাতে লিখে বিভিন্ন ঠিকানাই পাঠাই—সাড়া পাই প্রচুর। পুরোনো লেখকগোষ্ঠী দল বেধে নতুন পত্রিকায় চলে আসেন। চলে আসেন ব্যবস্থাপনার কাজে জন বেবী ও গুলাম রশুল। সাহায্য করেন তরুণ চট্টোপাধ্যায় ও রবি সেন। নৃপেন সান্যালের সাহায্যের কথা ভুলব না।

কয়েকজন কালক্রমে মতাদর্শগত ও অন্যান্য কারণে লেখা বন্ধ করেন। কিন্তু সাংবাদিকতা যে শুধু পয়সার খেলা নয় সেটা তাঁদের প্রাথমিক সহযোগিতা প্রমাণ করে। অন্য কারণে দু-একজন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ কখনো লেখেননি। কিংগ্‌সলি মার্টিন একদা 'নাও'-এর ভক্ত ছিলেন কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখেননি। লেখননি নীরদবাবু।

প্রথমদিকে খাটতে হয় প্রচুর। 'দর্পণ'-এর সম্পাদকমণ্ডলী দেড়টা ঘর ছেড়ে দেন। তালাচাবি কেনা, ফার্নিচার ভাড়া করা থেকে কাগজের বন্দোবস্ত নানা জায়গায় পায়ে হেঁটে করতে হয়। দু-একটা অভিজ্ঞতা ভুলব না। ডাকঘরের রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেলে দু-পয়সায় পত্রিকা পাঠানো যাবে, নইলে বিশ পয়সায়। ডাকঘরের দু-একজন বড়ো কর্তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করি ভাবী গ্রাহক তালিকা নিয়ে, যাতে এক সপ্তাহের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া যায়। কিন্তু দেখলাম একটি বাংলা সাপ্তাহিক সাত দিনের মধ্যে পেল, আমাদের লাগল তিন হপ্তার বেশি। শুনলাম বাংলা সাপ্তাহিকটি একটি কেরানিকে ৩০ টাকা দেওয়াতে ব্যাপারটা অতি

সহজে হয়ে যায়। উৎকোচের কথা ঠিক কী করে তোলা যায় জানতাম না, সঙ্কোচ হত—এখনও হয়।

'ফ্রন্টিয়ার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-র ১৪ই এপ্রিল, বাংলা নববর্ষে। প্রথমে ভেবেছিলাম টাকার অভাবে হয়তো আটকে যাবে, কিন্তু প্রথম থেকে কাটতি আশাতীত হওয়াতে ব্যাপারটা দাঁড়ালো মাছের তেলে মাছ ভাজার মতো। প্রথম দু-এক বছর বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি, প্রাণপণ খাটুনি ও ব্যক্তিগত অর্থকষ্ট ছাড়া ('নাও'-তে ব্যাবসার দিক, অর্থচিন্তা আমাকে করতে হত না)। 'নাও'-এর তুলনায় প্রথম বছর মাইনে ছিল অর্ধেকের কম। তারপর মাইনের ব্যাপারটা snakes and ladders-এর মতো, কখনো বাড়ে কখনো কমে, পত্রিকার আর্থিক অবস্থা বুঝে। দশ বছর কেটে গেছে, এখন প্রায়ই মনে হয়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়েছি—ভারতীয় মোষ তাড়ানো অবশ্য কোনো পত্রিকার সাধ্যের বাইরে। বিশেষ করে বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যক্তিরা অনেকে যখন বলেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্য 'আপনাকে শ্রদ্ধা করি' তখন মনে হয় শ্রদ্ধায় চিঁড়ে ভেজে না।

দিনকাল ছিল উত্তেজনায় ভরা। ১৯৬৮-তে চারিদিকে গরম হাওয়া, দেশে ও বিদেশে। দেশে নকশালবাড়ি আন্দোলন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ ১৯৬৯ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করা হয় অবশ্য, কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কীর্তিকলাপ উজ্জ্বল মনে হয়নি। অনেকে ভুলে গিয়েছেন যে খুনোখুনি প্রথম শুরু হয় ফ্রন্টসরকারের শরিকদের মধ্যে, ক্ষমতা বিস্তারের 'সংগ্রামে'। তারপর শুরু হয় নকশালপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ। জ্যোতিবাবু, প্রমোদবাবু নিহত মার্কসবাদীদের কথা এখনও কথায় কথায় বলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে জ্যোতিবাবুর জানা উচিত যে একজন মার্কসবাদী নিহত হলে অন্তত চারজন নকশালপন্থী খতম হতেন। থানা পুলিশ তাঁর হাতে ছিল, ওখানে নকশালপন্থীদের যাবার কোনো উপায় ছিল না।

'ফ্রন্টিয়ার' নকশাল ঘেষা পত্রিকা বলে খ্যাতি বা কুখ্যাতি অর্জন করে। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখায় ইন্দিরা ঘেষা উচ্ছ্বাস এখন পড়ে বিব্রত বোধ করি। 'বুড়োর দল' বিদায় হওয়াতে খারাপ লাগেনি, কিন্তু ভদ্রমহিলাকে নিয়ে উচ্ছ্বাসের মানে ছিল না।

১৯৭০-৭১ সালে নকশালপন্থীদের উচ্ছেদে সিপিএম-এর ভূমিকা? পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। কিন্তু মুজিবরের ব্যাপারে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর হস্তক্ষেপে সিপিএম-এর রাতারাতি ভোল বদল বিষয়ে একটা কথা বলা দরকার। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ইন্দিরাবিরোধী, কিন্তু পরদেশের সঙ্গে সংঘাত লাগলে জাতীয় সরকারকে সমর্থন—দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই ভূমিকা সিপিএম অনেকটা বজায় রেখেছে—চিনের সঙ্গে ১৯৬২-র সংঘর্ষটা অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম।

১৯৭২-এ নির্বাচনের কারচুপি হয়েছিল প্রচুর। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর জয় ছিল অবশ্যম্ভাবী, তিনি তখন উপমহাদেশের সুলতানা। তাঁর গুণমুগ্ধ সিপিএম নির্বাচনে যে বিশেষ সুবিধে করতে পারবে না পার্টির জানা উচিত ছিল। কিন্তু মাত্র ১৩-১৪টি আসন! ওটা ভাবা যায় না।

ষাট-সত্তর দশকের ভিয়েতনাম যুদ্ধের মহাকাব্য মানুষের আস্থাকে জিইয়ে রাখে। চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব নতুন আদর্শের সৃষ্টি করে। উৎপাদন ক্ষমতা হাতে এলেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ অব্যাহত হয় না, হাজার হাজার বছরের স্তূপীকৃত মানসিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জঞ্জাল অপসারণ, মনের কাঠামো, অভ্যাস পরিবর্তনের সংগ্রাম না চালালে সংশোধনবাদ বারে বারে ফিরে আসে।

দেশের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে চলে। মহান নেত্রীর মহিমা বেশিদিন থাকেনি। ১৯৭৪-এর রেলওয়ে ধর্মঘট দমনের নৃশংসতা, কানকাটা মিথ্যাচার যে ইঙ্গিত বহন করে তা অনেকে ধরতে পারেননি। আমাদের রাজনৈতিক পার্টিগুলির দূরদর্শিতা বিশেষ দেখি না। কোন সময় কাদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় আমরা জানি না। তাছাড়া ইন্দিরার পিছনে ছিল মহান সোভিয়েত দেশ, নেতৃত্ব না হয় সংশোধনবাদী কিন্তু বৈদেশিক কার্যকলাপে অতীব বিপ্লবী!

পূর্ব পাকিস্তানে, সিংহলে আন্দোলনের সময় চিনা নেতাদের বিবৃতি ব্যক্তিগতভাবে আমার ভালো লাগেনি। বাংলাদেশের পরবর্তী ঘটনাবলী অবশ্য চিনের বিশ্লেষণকে অনেকটা সমর্থন করে, কেননা চিনের প্রধান আপত্তি ছিল ভারতের হস্তক্ষেপে। 'এক কোটি' উদ্বাস্তু আগমনের অনেক আগে, প্রায় এপ্রিলের শুরু থেকে ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে, তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আছে।

দেশে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে আন্দোলন বিহার এবং অন্যত্র বাড়তে থাকে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়, গুজরাটে কংগ্রেসের পরাজয়—সব মিলিয়ে ভদ্রমহিলা অতি বিব্রত হয়ে পড়লেন। কথা ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে সিপিএম পন্থীদের চলা যেতে পারে। ময়দানের বিরাট একটা জনসভায় এ নীতি ঘোষিত হয়। নীতির পালন করা হয়নি অবশ্য।

২৬শে জুন ট্রামে অফিস যাচ্ছি, জরুরি অবস্থা ঘোষণার কথা শুনে প্রথমে কান দিইনি—একটা তো জরুরি অবস্থা চালু আছে, আর একটা আবার কোথা থেকে আসবে? কফি হাউসে গিয়ে শুনলাম প্রি-সেন্সরশিপ চালু হচ্ছে। 'ফ্রন্টিয়ার' তখন প্রেসে—তারিখ থাকবে ২৮শে জুন। ওই সংখ্যায় ইন্দিরা গান্ধী বিষয়ে একটি অতিশয় তীব্র সম্পাদকীয় ছিল (আমার লেখা নয়)। ওটা তখনও বন্ধ করা যেত; কিন্তু গা করিনি। পরে সংখ্যাটি বাজেয়াপ্ত হয়। ৫ই জুলাই সংখ্যায় প্রি-সেন্সরশিপের দরুন নানা অসুবিধের কথা তুলে একটি নোটিশ ছাপা হয়। কর্তৃপক্ষ লেখেন ওটা highly objectionable। দু-একটি ছাড়া সরকারি

বিজ্ঞাপন অবশ্য বন্ধ হয়ে যায় অনেক আগে, ১৯৭১ ডিসেম্বরে, রেডিও পাকিস্তান 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদকীয় থেকে দু-একটি উদ্ধৃতি পাঠ করার পর।

প্রি-সেন্সরশিপ ব্যাপারটা কী, কীভাবে চলতে হবে, কিছু জানতাম না প্রথম দিন-দুই। তারপর কয়েক সপ্তাহ লেখাপত্র মহাকরণে দিয়ে আসতাম, ফেরত পেতাম পরের দিন। শেষে মহাকরণে লিখলাম এভাবে সাপ্তাহিক নিয়মিত বের করা চলে না, অনেক কিছু শেষ মুহূর্তে ছাপাতে হয়—এবং তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সম্পাদকের। ছাপাখানায় বিশৃঙ্খলা ও অর্থের অভাবে কাজকর্ম ভালো হত না, তাই মহাকরণে লেখা পাঠানো বন্ধ করে দিতে হল। বিদেশি ব্যাপার নিয়ে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ বেরত, দেশের ব্যাপারে From the Press শীর্ষক একটি বিভাগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হত। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হত এভাবে পত্রিকা চালানো অর্থহীন। কিন্তু মানুষ অভ্যাস ও রুজির দাস। পত্রিকা উঠে গেলে কয়েকজন বেকার হবে।

এমারজেন্সির সময় পুরোনো লেখক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়, তার প্রধান কারণ দেশের বিষয়ে খোলাখুলিভাবে লেখার উপায় ছিল না। কোনোক্রমে একটা সম্পাদকীয় লিখতে পারলেই যথেষ্ট। ঝোঁক হত এমন একটা কিছু ছাপাই যাতে পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে উত্তর ভারতের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে কড়াকড়ি কম ছিল। এখানে ইন্দিরা-সঞ্জয়ের চেলাচামুণ্ডারা ইংরেজিতে ওয়াকিবহাল নয় বলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কিছুটা সুবিধে হয়। একজন মন্ত্রী তো 'স্টেটস্‌ম্যান' অফিস থেকে রাত্রে বেরিয়ে এসে সগর্বে বলেন যে সব কিছু 'census' করে দিয়ে এসেছেন।

একবার ভিয়েতনামের গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে চার পৃষ্ঠার একটি গল্প কম্পোজ করে প্রেসে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছি, খবর এল ওটা ছাপানো চলবে না—গেরিলা যুদ্ধের কথা না তোলাই ভালো। খবরটি দিল্লির ভিয়েতনাম দূতাবাসে একজন বিদেশি সাংবাদিকের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দেওয়াতে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করেন। 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী' সংগ্রামে মাঝে মাঝে বিচ্যুতি ঘটা অস্বাভাবিক নয়। সম্ভবত তাই পাটনার ফ্যাসিস্ট বিরোধী সম্মেলনে হ্যানয়ের প্রতিনিধিরা আসেন (এই অংশটি যখন লিখি তখন চিনের সঙ্গে ভিয়েতনামের ঝামেলা বাধেনি)।

দিন কাটছিল, দিনগত পাপক্ষয়। ১৯৭৬-এর মার্চের শেষে অফিসে বসে আছি, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একটি ফর্মা ছাপা হয়েছে, আর একটি মেশিনে উঠেছে, হঠাৎ সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এসে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে। 'দর্পণ' পত্রিকা কোনো লেখা মহাকরণে পাঠায় না, (আমরাও পাঠাতাম না) সেই 'দর্পণ' মুদ্রণের অপরাধে প্রেস বন্ধ করা হল, 'দর্পণ'-এর সম্পাদককে কোনো চিঠি লেখার প্রয়োজন সরকার বোধ করেনি। ছাপাখানায় চব্বিশ ঘণ্টা পালা করে সশস্ত্র পাহারা। 'ফ্রন্টিয়ার' ছাপা বন্ধ হয়ে গেল। মাস দেড়েক পরে সরকারের অনুমতি নিয়ে আমাদের নিউজপ্রিন্ট, প্রবন্ধ ইত্যাদি খালাস করতে গিয়ে শুনলাম

ছাপাখানার পিছন দিকে রাখা কয়েকটি ভারী ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি পাচার হয়ে গেছে একজন সশস্ত্র প্রহরী বলল, "বাবা, রাত্তিরে ওদিকে কে যায়, গা ছমছম করে।"

এপ্রিল-মে 'ফ্রন্টিয়ার' বন্ধ রইল (বন্ধ না থাকলে হয়তো ঋত্বিক ঘটকের কয়েকটি ছবি প্রথম দেখার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হত না)। অন্য ছাপাখানায় যাওয়া সম্ভব নয়, কেননা কর্তৃপক্ষ কামান দাগবেন ছাপাখানার উপর। পরে অত্যন্ত ছোটো একটি ছাপাখানা ভার নিতে কর্তৃপক্ষকে জানালাম প্রয়োজনবোধ করলে তাঁরা যেন পত্রিকার বিরুদ্ধে action নেন, ছাপাখানার বিরুদ্ধে নয়। প্রথম প্রথম কিছু গ্যালি প্রুফ পাঠানো হত, মুখ বন্ধের জন্য। কিন্তু তখন ২৪ ঘণ্টা নয়, প্রবন্ধাদি ফেরত পেতে প্রায় ২৬ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হত। সাপ্তাহিক এভাবে চলে না। লেখা পাঠানো আবার বন্ধ হল। এমারজেন্সিতে কিছু শিথিলতা তখন এসে গিয়েছে, অন্তত পূর্ব ভারতে।

১৮৭৬-এর ডিসেম্বরে বম্বে যাই, ফিরে আসার কয়েকদিন পরে নেহরু কন্যা নির্বাচনের কথা ঘোষণা করলেন। প্রথমে মনে হয়েছিল বিরোধী দল সুবিধে করতে পারবে না অর্থ, লোকবল ও সংগঠনের অভাবে। বাবুজীর পদত্যাগের পর শ্রীমতীর আবোলতাবোল কথাবার্তায় মনে হল তিনি বেশ বেকায়দায় পড়েছেন। তবে গোহারান হারবেন ভাবতে পারেননি। জুনে আবার কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে সে পরাজয়ের পুনরাবৃত্তি হল।

সে আশা-ভরসার দিন বিগত। (পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ বিষয়ে অনেকে অবশ্য আশাবাদী)। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না। অধিকাংশ ব্যাপারে অপরিসীম ক্লান্তি এসেছে। কয়েক বছরের মধ্যে কয়েকটি মৃত্যু ঘটে আপনজনের। অসীম পরহিতকারী যে দাদার বাড়িতে প্রতি রবিবার আড্ডা হত, তিনি মারা গেলেন ১৯৭৪ সালে; তার দিন পঁচিশেক পরে বাবা, ৮৩ বছর বয়সে। ১৯৭৭ সালে আমার মেজভাই বিগত হন। সেরিব্র্যাল স্ট্রোকের আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় তাঁর ওখানে ঘণ্টা তিনেক আড্ডা দিয়েছিলাম। বেসরকারি বৈমানিক অরুণ মুখোপাধ্যায়, নিরঞ্জন মজুমদার, কামাক্ষীপ্রসাদ তার আগেই বিগত হন। আরও কয়েকজনের মৃত্যু ঘটে, একজন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

এমারজেন্সির সময় হৃদতত্ত্ববিদ ড অমিয় বোস মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতেন; বলতেন কিছু একটা করা দরকার। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি পুলিশের বর্বরতা বিষয়ে একটি তথ্যভিত্তিক বই প্রকাশ করার উদ্যোগ করেছিল, সেটা ড বোস শেষ করে যেতে পারেননি। লিগাল এইড্ কমিটির হয়ে কিছু টাকা তুলি—কিন্তু এমারজেন্সির সময় চাঁদা তোলা বন্ধ হয়ে যায়।

বিদেশের পরিস্থিতি অনেক আশা ও আদর্শে আঘাত হেনেছে গত দু-তিন বছরে। তবে আমাদের মতো লোকের প্রতিক্রিয়ায় কী এসে যায়? আমরা এতদিনে নিজেরই ঘর সামলাতে পারিনি।

বাবু বৃত্তান্তে আমার ও বন্ধুবান্ধবদের অনেক কথা ইচ্ছে করে লিখিনি। অনেকে বর্তমান। আমার স্ত্রী দুই কন্যা, দুই নাতনি—বড়োটি ইতিমধ্যে বেশ লায়েক হয়েছে—এরা আমার নির্ভীক আত্মকথায় পুলকিত হবে না, যেমন হবেন না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনাবিশেষ বাদ দিলে দেশ ও দশের কী ক্ষতি? আমার বন্ধু ও বান্ধবী ভাগ্য—আঠারো বছর বয়স থেকে—সামান্য নয়, কিন্তু তাঁদের বিষয়ে লিখতে গেলে খেই পাব না। কয়েকজনের প্রভাব আমার (একদা) সাহিত্যিক ও ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় ব্যাপক কিন্তু এ মুহূর্তে সেটা চেপে যাওয়া ভালো। মধ্যবিত্তদের দৌড় সুবিদিত।

(বাবু বৃত্তান্ত। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮৮)